ক্লু

দু'দশকেরও বেশি সময় হয়ে গেল ছোটকা গোয়েন্দাগিরি করছে। তবে ও এটাকে ঠিক গোয়েন্দাগিরি হিসেবে নেয় না, মানে ওটাকে পেশা বা শখের পেশা হিসেবে দেখে না। আবার ব্যোমকেশ বক্সীর মতো সত্যান্বেষণও ওর লক্ষ্য নয়। বরং ও বলে নিছকই কৌতূহল নিরসনের উদ্দেশ্যেই ও কাজটা করে। ওর কৌতূহলেরও তো সীমা পরিসীমা নেই, যার জন্য লেখালেখি যে করে, তার তো কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয় নেই। যখন যেটা নিয়ে ওর পড়াশোনার ঝোঁক চাপে সেটা নিয়েই লিখে ফেলে। ফলে কথাটা বোধহয় ও ঠিকই বলে, কাজটা ও করে নিছকই ওর কৌতূহল মেটানোর জন্য।

সে যাই হোক, একটা কাজ দু'দশকেরও বেশি সময় ধরে করছে, কাজটায় যথেষ্ট সফলও, সুতরাং নামডাক তো একটু হবারই কথা। তা বলতে নেই, সেটা হয়েওছে। হয়েছে বলেই না প্রকাশক ছোটকার কাহিনিগুলিকে নিয়ে খণ্ডে খণ্ডে সেগুলিকে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ছোটকা, মানে অরিন্দম সেন, পেশায় অঙ্কের অধ্যাপক। পেশার বাইরে তার দুটি নেশা। একটি লেখালেখি, অন্যটি এই টিকটিকিগিরি। আর পেশায় যেহেতু অধ্যাপক, সেহেতু মার-দাঙ্গা, পিস্তলের ব্যবহার, এসব ছোটকার কাহিনিতে কার্যত অনুপস্থিত। অংকের অধ্যাপক পছন্দ করেন যুক্তি মেনে সিঁড়ি ভাঙ্গা অঙ্কের মতো ধাপে ধাপে সমাধানে পৌঁছোতে। অর্থাৎ, মারণাস্ত্র নয়, ফেলুদার মতো মগজাস্ত্রই ছোটকার হাতিয়ার। ফলে যারা থ্রিলার পছন্দ করেন তাদের নয়, ছোটকার কাহিনিগুলি পছন্দ হবে যারা ধাপে ধাপে রহস্য উদঘাটনের প্রকৃত রসাস্বাদন করতে পারেন, তাদের।

ছোটকার কাহিনিগুলি গোয়েন্দা গল্পের পরিচিত ছকের মধ্যেই মূলত সীমাবদ্ধ। এই কাহিনিগুলিতে একজন কথক আছে, যে ছোটকার ভাইপো। সূত্রধর ভাইপো দীপুর সূত্রেই অরিন্দম সেন ছোটকা হিসেবেই পরিচিত হয়ে উঠেছে। ছোটো থেকেই এক ছাদের তলায় বসবাস, দীপু তাই তার ছোটকাকে চেনে খুব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। ছোটকার প্রতিটি অভ্যাস, বদভ্যাস সবই তার খুব চেনা, পরিচিত। আর এমন একজন কথক কাহিনিগুলি উপস্থাপিত করায় ছোটকার গল্পগুলিতে কখনোই ছোটকা সুপারহিরো হয়ে ওঠেনি। বরং আমাদের চেনা পরিচিত জগতের মধ্যেই ছোটকাকে খুঁজে নিতে কোনও অসুবিধা হয় না।

একটি নির্দিষ্ট চরিত্রকে কেন্দ্র করে লেখক যখন ধারাবাহিকভাবে লিখতে শুরু করেন তখন প্রতিটি লেখাতেই সেই সময়ের একটা ছাপ পড়েই যায়। এই কাহিনিগুলি পড়তে গিয়ে সেই ছাপের পরিচয় পাঠক পাবেন। তাই মোটামুটি কোন সময় লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল তার একটি উল্লেখ প্রতিটি লেখার শেষেই থাকছে। এই ধরনের সংকলনের ক্ষেত্রে লেখাগুলিকে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপিত করলে পাঠকের একটা সুবিধা হয় বুঝতে, যে কীভাবে চরিত্রটি ধীরে ধীরে পূর্ণতা পেয়েছে। কিন্তু আমরা এই ধারাবাহিক সংকলনের ক্ষেত্রে সেই পদ্ধতিটি অনুসরণ করিনি। না করার একটি কারণ, বিভিন্ন স্বাদের লেখাকে প্রতিটি খণ্ডে মিলিয়ে মিশিয়ে দেওয়া। যদি কেউ উৎসাহী হন এই ধারাবাহিক প্রক্রিয়াটিকে বোঝার জন্য তাহলে তাকে লেখার শেষের সাল তারিখটিকে মাথায় রাখতে হবে।

গল্প উপন্যাসের ক্ষেত্রে দীর্ঘ ভূমিকা পাঠ প্রত্যেকের কাছেই বিরক্তিকর বিষয় বলেই মনে হয়। সুতরাং প্রাককথনের এখানেই ইতি। এরপর যা কিছু বলার সব কাহিনিগুলিই বলবে আর আমাদের যা কিছু শোনার তা আমরা পাঠকের কাছ থেকেই শুনব, এই বইয়ের ভালো-মন্দ এবং ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আরামবাগ
নভেম্বর ৬, ২০২৪

অনিন্দ্য ভুক্ত

জগন্নাথের মার	৯
রং নাম্বার	৪৩
কা তব কান্তা	৮৬
উত্তরাধিকার	১৪৬
অন্তর্ধানের আড়ালে	১৮১

জগন্নাথের মার

কোথাও কোনও শব্দ হল কি? তীব্র, তীক্ষ্ণ কোনও আর্ত চিৎকার? একটু সতর্ক হয়ে কান পাতলাম। কানে এল এক্সপ্রেস ট্রেনের তীক্ষ্ণ হুইসল। তারপরই ট্রেন ছোটার সেই ছন্দময় শব্দ। একটানা, একঘেয়ে, কিন্তু ছন্দবদ্ধও। ছন্দ গাড়ির চলার শব্দে, ছন্দ গাড়ির দোলাতেও। এই ছন্দময় শব্দ আর দুলুনির আকর্ষণেই বোধ হয় অধিকাংশ মানুষের গাড়িতে ঘুম আসে, ঘুমোতে কোনও অসুবিধে হয় না। কিন্তু কোনও কালেই আমার ঘুম হয় না গাড়িতে। গাড়িতে আমার সঙ্গী হালকা কোনও থ্রিলার। কিন্তু এই রাতের ট্রেনে সে-ই বা আর কতক্ষণ? এগারোটার পর আলো জ্বেলে রাখা চলে না। তারপর, অগত্যা সারা রাত ধরে চলে বার্থে শুয়ে এপাশ ওপাশ করা। মাঝে মধ্যে ঘুমের একটা চটকা আসে, ভাঙতেও দেরি হয় না। সেইরকমই এক চটকার মধ্যে ছিলাম। চটকা কেটে যেতে ফের সেই এপাশ ওপাশ করছিলাম। করতে করতেই উঠে পড়লাম। একবার টয়লেটে যাব।

মোট বাহাত্তরটা বার্থ এই কামরায়। আমার ঊনচল্লিশ নাম্বার। কামরার ঠিক মাঝে। বাঁদিক বা ডানদিক, যে কোনও দিকের টয়লেটে যাওয়াই অতএব আমার কাছে সমান। ট্রেনে উঠেই পর পর দু'বার গিয়েছিলাম। একবার বাঁদিকে, একবার ডানদিকে। ডানদিকের টয়লেট পানের পিকে রঞ্জিত, জানলার কাচ নেই, কলের ট্যাপের মাথা আধভাঙা। অতএব বাকিটা সময় যে বাঁদিকের টয়লেটে যাব তা বলাই বাহুল্য।

আস্তে করে উপরের বার্থ থেকে নীচে নামলাম। কামরার আবছা আলোয় চটিটা গলাতে গলাতে দেখলাম ছোটকা ঘুমোচ্ছে। গাঢ় নিদ্রা। ট্রেনের দোলায় হাওয়া বালিশে ছোটকার মাথা এদিক ওদিক দুলে যাচ্ছে। ঘুমের তাতে কোনও ব্যাঘাত ঘটছে না।

বেশ জোরে ছুটছে গাড়ি এখন। প্রায় টলতে টলতে টয়লেটের সামনে এলাম। আরে, কী উজবুক লোক সব, কামরার দরজাটা দিয়ে শোয়নি কেন?

সাধারণত দরজার সামনে যাদের বার্থ পড়ে, এটা তাদেরই অলিখিত ডিউটি। উঁকি মেরে দেখলাম, আশপাশে সবাই ঘুমে কাদা। দরজা দুটো বন্ধ করে বাঁ হাতের টয়লেটে ঢুকতে গেলাম। ভিতর থেকে বন্ধ। সরে এসে ডানদিকেরটাতেই ঢুকতে যাব, খুট করে একটা শব্দ হল। বাঁদিকের টয়লেট থেকে যে বেরিয়ে এল তার নাম আমার জানা হয়ে গিয়েছে, প্রমিতা। আলাপ হয়নি, তবে ওর সঙ্গীদের ডাকাডাকিতে নামটা আমি শুনে নিয়েছি। আমার বার্থের তারজালির ওপাশেই প্রমিতার বার্থ। আমাকে দেখেই যেন একটু চমকে উঠল প্রমিতা। তারপর তাড়াতাড়ি মাথা নীচু করে পাশ কাটিয়ে চলে গেল। রাত হয়ে গিয়েছে বলে বোধ হয় সতর্কতাটা কম ছিল। ওর চমকে ওঠার কারণটা যেন আমি বুঝতে পারছিলাম। ওই অবস্থায় আচমকা আমাকে দেখে লজ্জা পেয়ে গিয়েছে।

প্রমিতার বার্থ নাম্বার চৌত্রিশ। আমি এক নাম্বার বার্থের দিকে টয়লেটে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে প্রমিতাদের আট বার্থের ব্লকটা আগে পড়ল। প্রমিতা বার্থের উপর বসে, সামনে ঝুঁকে চুল আঁচড়াচ্ছে। চোখাচোখি হতে সামান্য হাসল। একটু কি লাজুক, লাজুক? নাকি একটু নার্ভাস, নার্ভাস?

চটি খুলে বার্থে উঠে একটা হালকা পারফিউমের গন্ধ পেলাম। বাব্বা, এর মধ্যে পারফিউমও মাখা হয়ে গেল? মেয়েরা পারেও বটে। রাত দুপুরে প্রসাধন চর্চা! কবজি উলটে ঘড়ি দেখলাম। দুটো। 'ঠিক দুক্কুরবেলা। ভূতে মারে ঠেলা।' কী জানি লাইন দুটো কেন মাথায় এল।

এই আপার বার্থগুলোতে বসে থাকা যায় না। অতএব ফের শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে পিছন থেকে প্রমিতাকে দেখতে লাগলাম। এই নিশুতি, নিস্তব্ধ রাতে প্রমিতার প্রতি একটা চোরা আকর্ষণ অনুভব করছিলাম আমি।

দুই

ছোটকার সঙ্গে আমার বয়সের ফারাক দশ। তবে এটা শরীরের বয়সের কথা। মনের বয়সের হিসাব কষলে ফারাকটা আরও বাড়বে। দেখা যাবে দু'পা নয়, ছোটকা এগিয়ে দুশো পা। পড়াশোনাতে চিরকাল দুর্দান্ত সব রেজাল্ট করাই শুধু নয়, ছোটকা এগিয়ে তার এন্তার পড়াশোনা দিয়ে। ফলাফল : এই তিরিশ বছর বয়সেই ও দুটো চাকরি ছেড়ে তৃতীয়টায় ঢুকেছে। প্রথমে এল.আই.সি., তারপর এমপ্লয়মেন্ট অফিসার, এখন অধ্যাপক। তবে এটাতেও কতদিন

টিঁকবে বলা মুশকিল, বা আদৌ কোনও চাকরিতে টিঁকবে কি না। ওর মতির যা রিপোর্ট মাঝে মধ্যে বাড়িতে এসে পৌঁছোয় তাতে বাবাই বলে, "তোর কেবল মাথাই নয় রে বুটে, কপালটাও নেহাতই খুব ভালো।"

বুটে ছোটকার আটপৌরে নাম, পোশাকি নাম অরিন্দম। অরিন্দম সেন। অঙ্কের অধ্যাপকের সাম্প্রতিক কীর্তি সে অঙ্কের ক্লাসে ইতিহাস পড়িয়ে এসেছে। প্রাচীন ভারতে অঙ্কশাস্ত্রের কী উন্নতি ঘটেছিল। ছেলেরা উসখুশ করেছে, অধ্যাপক খেয়াল করেননি।

ছোটকার ঘুম ভাঙে ঠিক কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটায়। ওর ভাষায় 'শার্প অ্যাট ফাইভ'। সত্যিই কোনও অ্যালার্ম ঘড়ির প্রয়োজন হয় না ওর। ও বলে, "মানুষের রাতের ঘুমটা এমনই। দেখবি ঘুমটা ভাঙে ঠিক নির্দিষ্ট একটা সময়ে, তা সে তুই রাত করেই শো বা সকাল করে।"

আমিও দেখেছি কথাটা সত্যি। যখনই শুই আমার উঠতে ঠিক সাড়ে ছ'টা। তবে ছোটকার ওই 'শার্প অ্যাট' আমার দ্বারা হয় না। সাড়ে ছ'টা, মাঝে মাঝে সওয়া ছ'টাও যেমন হয়, তেমনি পৌনে সাতটাও হয়ে যায় কোনও কোনও দিন।

আজ ট্রেনেও ছোটকার ঘুম ভাঙল শার্প অ্যাট ফাইভে। সারারাত না ঘুমিয়ে আমার শরীর তখন ভেঙে আসছে। ক্লান্তিতে ঘুম ঘুম ভাবও একটা আসছে। বার্থ থেকে নেমেই ছোটকা আমার দিকে উঁকি মারল, "কী, ঘুমোসনি তো সারারাত?"

"তাতে তোমার আর কী?"

আমি কপট রাগের ভঙ্গি করলাম। হাসল ছোটকা।

"যা উঠে পড়। মুখে চোখে জল দিয়ে নে। নইলে ক্লান্তি কাটবে না।"

বলেই ব্রাশ পেস্ট হাতে বাথরুমের দিকে চলে গেল। গড়িমসি ছেড়ে আমিও উঠে পড়লাম। ট্রেন বেশ লেটে চলছে। প্রায় নাকি তিন ঘণ্টা। আশপাশের কথাবার্তা থেকে তথ্যটা কানে এল। কিছু লোক যে কীভাবে সব খবর পেয়ে যায়। তবে হাওড়া থেকে পুরী, এইটুকু রাস্তায় দেড় ঘণ্টা লেট মানে অনেকটা লেট।

হাতে গরম চায়ের ভাঁড় নিয়ে এইসব ভাবতে ভাবতেই বাইরের দিকে চেয়েছিলাম। হইচইটা কানে এল তখনই। 'গেল কোথায় ছেলেটা', 'ওটা চিরকালই এমন উজবুক' জাতীয় মন্তব্যের মধ্যে থেকেই টের পাওয়া গেল অশোককে পাওয়া যাচ্ছে না। অশোক, অর্থাৎ যে ছেলেটিকে কাল সন্ধেবেলা

ট্রেনে ওঠার পর থেকেই প্রমিতার গায়ে গায়ে লেপ্টে থাকতে দেখেছি। ছেলেটির ভাবভঙ্গি দেখে, সত্যি বলতে কী, একটু খারাপই লেগেছিল আমার। কেমন যেন একটা স্পর্শসুখ উপভোগ করতে চাইছে, দেখে এমনটাই মনে হচ্ছিল।

যাকগে, যাদের ব্যাপার তারাই বুঝুক। জলজ্যান্ত একটা ছেলে তো আর চলন্ত ট্রেন থেকে উধাও হয়ে যেতে পারে না। হয়তো অন্য কোনও কামরায় অন্য কোনও বান্ধবীর স্পর্শসুখ পেতে গিয়েছে।

ভাবনাটা মাথায় আসতে নিজেই অবাক হয়ে গেলাম। আশ্চর্য, এত রাগ কী করে হল আমার ছেলেটার উপর, কেনই বা হল? সম্ভবত ছেলেটার আঁটোসাঁটো পোশাক, গায়ে পড়া ভাব, একটু ওভারস্মার্ট, একটু অতিচালাক ভাবভঙ্গি— এসবই আমাকে মানসিকভাবে বিরক্ত করে রেখেছিল। এখন সুযোগ পেতেই তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

"ব্যাপার কী রে, ট্রেন যে একেবারে ন যযৌ ন তস্থৌ হয়ে গেল!" ছোটকার কথাতেই ঘোর কেটে গেল আমার। এলোমেলো চিন্তা থেকে মনটাও সরে এল। হাতঘড়িতে সময় দেখলাম। আটটা দুই। অর্থাৎ প্রায় দেড় ঘণ্টা হয়ে গেল এই স্টেশনেই আটকে আছি আমরা।

খুরদা রোড। জংশন স্টেশন। অমিতের কর্মস্থল এটি। অমিত আমাদের জামাই। টিয়ার হাজব্যান্ড। অমিতের সঙ্গে ছোটকার পটে ভালো। বুদ্ধিমান ছেলে। ছোটকার কাজেকর্মে সাহায্যও করে বেশ। স্টেশনের কাছেই ওর বাড়ি।

"এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে জানলে দিব্যি অমিতের বাড়ি থেকে ঘুরে আসা যেত।"

ছোটকাই ফের মন্তব্য করল। বিরক্তি। স্বাভাবিক। বিরক্তি আমারও লাগছিল।

"যা বলেছ। আরে বাবা ছাড়তে দেরি হবে তো অ্যানাউন্স করে দে। কামরার ভেতরের লোকগুলো অন্তত একটু হাত পা ছড়িয়ে নিত। তা নয়, দেড় ঘণ্টা ধরে এই ছাড়বে, এই ছাড়বে করেই কাটিয়ে দিল।"

একটু ক্ষুব্ধ গলাতেই বললাম আমি।

"কী, আপনাদের সঙ্গীটিকে খুঁজে পাওয়া গেল?"

ছোটকার প্রশ্ন। প্রমিতাদের দলেরই একজন যাচ্ছিলেন, সম্ভবত প্রমিতার বাবা কিংবা কাকা হবেন, তাঁকে উদ্দেশ্য করেই ছোটকা প্রশ্নটা ছুঁড়েছিল।

ভদ্রলোক থেমেও গেলেন। দু'দিকে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, "সারা ট্রেন তো তন্ন তন্ন করে খোঁজা হল। কোথায় যে গেল?"

"আপনারা টের পেলেন কখন? কোথায়?"

"এই তো সকালে। খুরদা রোডে ঢোকার একটু আগে।"

"যাবে আর কোথায়? দেখুন আপনারা খোঁজাখুঁজি করছেন বলে সে স্টেশনেই কোথাও লুকিয়ে বসে আছে।"

"লুকিয়ে বসে আছে! তেমন ছেলে তো সে নয়।" ভদ্রলোক প্রায় স্বগতোক্তির মতো করলেন।

"আপনাদের সঙ্গে গতকাল কিছু গোলমাল হয়েছিল নাকি?" ছোটকা ফের প্রশ্ন করল।

"গোলমাল? না, না। বেড়াতে এসে আবার গোলমাল কীসের? এই তো প্রমিতা বলছিল, কাল রাত বারোটা পর্যন্ত ওর সঙ্গে গল্প করেছে।"

"প্রমিতার বন্ধু বুঝি?"

খুব আলতো করে প্রশ্নটা ভাসিয়ে দিল ছোটকা। ভদ্রলোক বোধহয় এবার একটু সতর্ক হয়ে গেলেন। অপরিচিত ভদ্রলোকের সামনে এত কথা বলা বোধ হয় উচিত হচ্ছে না। সামান্য ইতস্তত করলেন, ইতস্তত ভঙ্গিতেই জবাব দিলেন,

"আমার শ্যালক। আমি প্রমিতার বাবা।"

বলেই দ্রুতপায়ে চলে গেলেন।

তিন

বিকেলে সি বিচে গিয়েই খবরটা পাওয়া গেল। জগন্নাথ এক্সপ্রেসে আমাদের সামনের বার্থেই ছিলেন প্রমথেশবাবু। রেলে চাকরি করেন। বাড়ি পাইকপাড়ায়। আমরা বেলগাছিয়ার মিল্ক কলোনিতে থাকি শুনে নিজেই উদ্যোগী হয়ে এসেছিলেন। একটু বেশি বকবক করেন। বিকেলবেলা হাওয়া খেতে বেরিয়ে ফের তাঁর মুখোমুখি পড়ে গেলাম। মুখোমুখি মানে, আমাদের দেখে ভদ্রলোকই দ্রুত পায়ে এগিয়ে এলেন। চোখেমুখে উত্তেজনার ছাপ স্পষ্ট। কাছে আসার তর সইছিল না। ফুট পনেরো কুড়ি দূর থেকেই চেঁচিয়ে বললেন, "শুনেচেন মশাই? সাংঘাতিক কাণ্ড।"

বলতে বলতেই এগোলেন। এগিয়ে এসে বললেন, "বাপরে কী কাণ্ড!

একেবারে খুন! আমার বাপের সাতজন্মে কোনোদিন চোখের সামনে খুন দেকিনি মশাই।"

"খুন!"

আমার মুখ দিয়ে আপনিই বেরিয়ে এল শব্দটা। আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলাম, ছোটকা তার পা দিয়ে আমার পা টিপে দিল। অর্থাৎ থাক, উনি নিজেই বলবেন। প্রমথেশবাবুর চোখ তখনও কপাল ছেড়ে নীচে নামেনি।

"তা হলে আর বলচি কী মশাই? অত খোঁজাখুঁজি, তা করলে কী হবে? সে ব্যাটা তো তখন মরে একশো মাইল পেছনে পড়ে আছে।"

আমার বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়ছিল। আরে বাবা কার কথা বলছিস, সেটা তো আগে বলবি। খুনটা কে হয়েছে? কিন্তু প্রশ্ন করার আগে এবার ছোটকাই প্রশ্ন করল,

"আপনি কি ওই... ট্রেনের অশোকবাবুর কথা বলছেন?"

"তা নয়তো আর কার মশাই? আপনার-আমার পরিচয় তো ওই ট্রেনেই। যা কিছু ঘটল তো ওই ট্রেনেই। অন্য কোনও জায়গার, অন্য কোনও ঘটনা বললে আপনি বুজবেন কি?"

ছোটকা প্রমথেশবাবুকে থামতে দিল। থামার পরে বলল, "তো আপনি অশোকবাবুকে চোখের সামনে খুন হতে দেখলেন?"

এবার সামান্য হোঁচটই খেলেন প্রমথেশবাবু। আমতা আমতা করতে করতে বললেন, "না, মানে আমি বলচিলুম কী... মানে আমাদের সঙ্গেই তো আসচিলেন... তারপর হটাৎ দেকলুম মানুষটা নেই... অ্যাখন শুনচি খুন... এ তো প্রায় চোকের সামনেই খুন মশাই।"

"হুঁ। বুঝলাম। আচ্ছা চলুন, এবার একটু এগোনো যাক।"

এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কথা হচ্ছিল। ফের চলতে শুরু করল ছোটকা। পাশে পাশে আমরা। খানিকটা চুপচাপ হাঁটার পর ছোটকা প্রশ্ন করল,

"খবরটা আপনি পেলেন কোথায়?"

মুখ দিয়ে একটা চুক চুক শব্দ করলেন প্রমথেশবাবু, যেন খবরটা না রেখে আমরা অন্যায় করেছি।

"প্রশ্নটা তো আমারই অরিন্দমবাবু। সারা পুরীর লোকজন যে খপর জেনে গ্যাচে, সে খপর আপনাদের কানে পৌঁচোল না, এটাই তো আশ্চর্যের।"

মুখ দেখে বুঝলাম ছোটকা বিরক্ত হয়েছে। তবে বিরক্তি চেপে স্বাভাবিক গলাতেই বলল, "আসলে আমি একটু ঘরকুনো, বুঝলেন। সেই যে এসে ঘরে

ঢুকেছি, বেরোনো হয়নি।"

"অ, তাই বলুন। তবে মশাই, বেড়াতে এসে তো আর ঘরের মধ্যে সেঁদিয়ে থাকলে চলবে না।"

প্রসঙ্গ আবার অন্যদিকে চলে যাচ্ছে দেখে আমি মাথা গলালাম।

"ডেডবডি পাওয়া গেছে?"

"পাওয়া-গ্যাচে কী বলছেন মশাই? ডেডবডি দেখেই তো টের পাওয়া গেল ভদ্দরলোক আর নেই।"

"কোথায় পাওয়া গেল ডেডবডি?"

এবার ছোটকার প্রশ্ন।

"পাওয়া গ্যাচে কটকের কাচে। ওঁরা তো রেল পুলিশে মিসিং ডায়েরি করেচিলেন। বেওয়ারিশ একটা বডি পেতেই তাই রেলপুলিশ পুরী থানার সঙ্গে যোগাযোগ করে। থানাতেই চিত্তবাবুরা বডি চিনতে পারেন।"

"চিত্তবাবু... মানে..."

"ওই যে ওই মশাই, প্রমিতার বাবা। মেয়েটা নাকি খুব কান্নাকাটি করচে।"

বলতে বলতেই গলা নীচু করলেন প্রমথেশবাবু,

"শুনচি নাকি কী সব ছিল দুজনের মধ্যে। অ্যাখন তো কাঁদতে হবেই।"

ইতিমধ্যে সি বিচ ছেড়ে রাস্তায় উঠে এসেছিলাম, হাঁটছিলাম রাস্তার এক ধার ঘেঁষেই। একটা জিপ আসছিল উলটো দিক থেকে। কাছাকাছি আসতে দেখি পুলিশের জিপ। হঠাৎ আমাদের কাছে এসে লম্বা একটা ব্রেক কষে জিপটা দাঁড়িয়ে গেল। একজন লম্বা, সুদর্শন যুবক জিপ থেকে নামতে নামতে চেঁচিয়ে উঠল, "আরে অরিন্দম যে!"

মুহূর্তের মধ্যে ছোটকার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখলাম।

"সঞ্জয় তুই... এখানে পোস্টিং বুঝি?"

ভদ্রলোক ততক্ষণে এসে ছোটকার হাত ধরে টান মেরেছেন,

"জিপে ওঠ, যেতে যেতে কথা হবে।"

ছোটকা একটু ইতস্তত করল, "যাচ্ছিস কোথায়?"

ভদ্রলোক সম্ভবত অফিসার পদমর্যাদার। সাজপোশাকে তাই মনে হচ্ছিল। এবার সামান্য থমকালেন, "আর বলিস কেন? আমাদের যেমন পেশা। একটা খুনের কেস।"

"খুন?"

"হুঁ, আপ জগন্নাথ এক্সপ্রেসে এক ভদ্রলোক খুন হয়েছেন।"

খুন শব্দটা শোনামাত্রই প্রমথেশবাবুর মুখের ভাব পালটে গিয়েছিল। এবার দেখলাম কিছু বলার জন্য উসখুশ করছেন। আমি ওঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করলাম, "চুপচাপ থাকুন দাদা। জানেন তো বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা আর পুলিশে ছুঁলে..."

"ছত্রিশ।"

বলেই ভদ্রলোক চুপ করে গেলেন।

"তা তুই এখন যাবি কোথায়?"

ছোটকা প্রশ্ন করল তার বন্ধুকে।

"হোটেল জগন্নাথ।"

এক মুহূর্ত কী ভাবল ছোটকা। তারপর বলল, "চ...অ...ল। চল তাহলে, ঘুরে আসি। আসি প্রমথেশবাবু।"

প্রথম 'চল'টার লক্ষ্য বন্ধু। দ্বিতীয়টি আমার উদ্দেশ্যে, ঘাড় ঘুরিয়ে।

চার

"আপনার নাম?"

"চিত্তপ্রকাশ রায়।"

"বাড়ি কোথায়?"

"কলকাতায়।"

একটু ধমক উঠে এল পুরী থানার অফিসার-ইন-চার্জ সঞ্জয় রায়ের গলায়, "কলকাতার কোথায়?"

"বেহালায় স্যার।"

"কী করেন আপনি?"

"ব্যাঙ্কে চাকরি করি। ক্লার্ক।

"কোন ব্যাঙ্ক?"

"ইউ.বি.আই। কলকাতা মেইন ব্রাঞ্চ।"

"ক'জন এসেছেন আপনারা বেড়াতে?"

সামান্য একটু ভেবে নিলেন চিত্তবাবু। বোধ করি গুনে নিলেন। "দশজন স্যার।"

"ট্রেনের বুকিং-টুকিং বোধহয় আপনি করেননি, না?"

আচমকাই একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল ছোটকা। একেই ভদ্রলোক পুলিশের

সঙ্গে আমাদের দেখে একটু হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন, তারপর এই আচমকা প্রশ্নে একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। প্রায় আমতা আমতা করতে করতেই উত্তর দিলেন, "না... মানে... মানে এসব ব্যাপার তো অশোকই দেখত।"

"হুম...ম, তা অশোক কে হত আপনার?" ফের পুলিশি জেরা শুরু করলেন সঞ্জয় রায়।

"আমার শ্যালক।"

"কাজকর্ম কী করত?"

"আপাতত কিছু করছিল না স্যার। থাকত আমাদের কাছেই। সংসারের টুকটাক সব কাজ করে দিত।"

"কাল শেষ কখন দেখেছিলেন ওকে?"

একটু ভাবলেন চিত্তবাবু। ভেবে বললেন, "আমি তো দশটায় শুয়ে পড়েছিলাম। তার আগে একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া হল সাড়ে ন'টা নাগাদ। হ্যাঁ, তখনই শেষ দেখেছিলাম অশোককে।"

"ঠিক আছে। ধন্যবাদ। আমরা আবার আসব।"

বলেই টেবিল থেকে টুপিটা তুলে নিলেন সঞ্জয় রায়। তুলতে তুলতেই বললেন, "আর হ্যাঁ, পুলিশের অনুমতি ছাড়া আপনারা কেউ পুরী ছেড়ে কোথাও যাবেন না।"

জগন্নাথ হোটেলের চারতলার প্রমিতাদের ঘর থেকে তিনজনে বেরিয়ে এলাম আমরা। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই প্রশ্নটা করে ফেলল ছোটকার বন্ধু, "তুই হঠাৎ ওই প্রশ্নটা করলি কেন অরিন্দম?"

হাসল ছোটকা। যেন প্রশ্নটা উঠবে সেটা জানত।

"ভেবে দ্যাখ সঞ্জয়, ক'জন মিলে বেড়াতে এসেছেন সেটা ভদ্রলোককে গুনে বলতে হল। যদি নিজে টিকিট কাটতেন তা হলে এমন হত কি?"

"তা হয়তো নয়। কিন্তু এতে প্রমাণ কী হয়?"

"প্রমাণ হয় এই যে, ভদ্রলোক অশোকবাবুর উপর নির্ভর করতেন অনেকটা।"

"স্যরি, মানা যাচ্ছে না। বেড়াতে যাবার টিকিট একে তাকে দিয়ে অনেকেই কাটায়।"

"কাটায়, কিন্তু সেক্ষেত্রে দলের সদস্য সংখ্যাটা তাকে আর গুনে বলতে হয় না সঞ্জয়।"

হোটেল থেকে বেরিয়ে আমরা ততক্ষণে রাস্তায়। সন্ধে নেমে গেছে চারিদিকে জ্বলে উঠেছে আলো। হাঁটতে হাঁটতে আমরা প্রায় স্বর্গোদ্বারের কাছাকাছি চলে এসেছি। দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি চিতার আগুন। শুনেছি এই আগুন নাকি কখনও নেভে না, মানে স্বর্গোদ্বারের এই শ্মশানে সব সময়েই একটা না একটা চিতা জ্বলে। শুনলে একটু অবাক হবারই কথা, কেননা পুরী আর কতটুকুই বা জায়গা, সেখানে প্রতিমুহূর্তে তাহলে কত মানুষ মারা যাচ্ছে যে শ্মশানের আগুন কখনোই নিভছে না? আসলে এর পিছনে হয়তো অন্য একটা কারণ থাকতে পারে, আরও একটা অন্য প্রচলিত মিথ। সেই মিথ অনুযায়ী, কারও মৃত্যুর পর যদি তাকে এই স্বর্গোদ্বারে দাহ করা হয় তাহলে মৃত ব্যক্তি এখান থেকেই সোজা স্বর্গে চলে যেতে পারে, নরকে-টরকে আর যেতে হয় না তাকে। সেই কারণে, এই বিশ্বাস থেকে, দূরদূরান্ত থেকে প্রতিনিয়তই মানুষ আসতে থাকে স্বর্গোদ্বারে দাহের জন্য।

"ওঁদের জগন্নাথ এক্সপ্রেসের এস-সেভেন কোচের প্যাসেঞ্জার লিস্টটা আমায় জোগাড় করে দিতে পারিস, সঞ্জয়?"

হঠাৎ করে ছোটকার এই কথায় হাঁ হয়ে গেলাম আমি। বলে কী ও? এবার কি শেষে গোয়েন্দাগিরিতে নামবে নাকি? চোখ কপালে উঠে গিয়েছিল সঞ্জয় রায়েরও। হঠাৎই থমকে দাঁড়ালেন তিনি। খানিকক্ষণ একদৃষ্টে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে করে বললেন, "পাঠিয়ে দেব।" বলেই ফের হাঁটা শুরু করলেন।

কয়েক মুহূর্ত আমরা কেউ আর কোনও কথা বললাম না। তারপর সঞ্জয়বাবুই আবার বললেন, "দেখিস, আবার যেন আমাদের ভাত মারিসনি।" বলতে বলতেই আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

"আপনি আর আপনার কাকাকে কতটুকু চেনেন দীপঙ্করবাবু। আমরা বন্ধুরা বলতাম, ও ব্যাটা হাত দিলেই সোনা। যেখানে দেবে, সেখানেই।"

বন্ধুর কমপ্লিমেন্ট যে দিব্যি উপভোগ করছে, তা ছোটকার মুখ চোখ দেখেই বুঝতে পারছিলাম।

পাঁচ

রাতে খেতে বসার আগেই ছোটকার হাতে এস-সেভেনের প্যাসেঞ্জার লিস্ট এসে গিয়েছিল। লোক দিয়ে সঞ্জয় রায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আর ছোটকাও

খেয়েদেয়ে সেই যে লিস্ট নিয়ে পড়ল, একটু গল্প করব তার আর উপায় রইল না। অগত্যা খানিকক্ষণ ঘরের লাগোয়া বারান্দা থেকে সমুদ্র দেখে, খানিকক্ষণ গল্পের বই পড়ে আমি শুয়ে পড়েছিলাম।

সকালে উঠে দেখি ছোটকা বাথরুমে। টেবিলে সেই প্যাসেঞ্জার লিস্ট পড়ে আছে। পাশে ছোটকার নিজের হাতে তৈরি আর একটা লিস্ট। এক ঝলক তাকিয়েই বুঝতে পারলাম প্রথম লিস্টটা থেকেই এই দ্বিতীয় লিস্টটা বানানো হয়েছে। ছোটকার মতিগতি নিয়ে ভাবছি, এমন সময়ই ও বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল।

"উঠে পড়েছিস?"

"সে তো দেখতেই পাচ্ছ। কিন্তু তুমি কাল শুলে কখন?"

"একটা হবে।"

"কী করছিলে অতক্ষণ, এই লিস্ট তৈরি?" ছোটকা হাসল।

"দেখেছিস?"

"দেখেছি। তবে বুঝিনি কিছু।"

"একটু মাথা ঘামালেই বুঝতে পারতিস।... খুনটা হয়েছে কখন?"

"সে কী করে বলব, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট তো পাওয়া যায়নি।"

"না গেলেও, মোটামুটি একটা আন্দাজ করতে অসুবিধা হয় না। আমার ধারণা খুন হয়েছে রাত দুটো নাগাদ, ট্রেন কটক স্টেশনে ঢোকার সামান্য আগে।"

ছোটকা 'রাত দুটো নাগাদ' বলা মাত্রই আমার বুকটা ধক করে উঠল। তবে কি আবছা ঘুমে যা শুনেছিলাম তাই-ই ঠিক? সেই আর্তনাদ? সেটা কি মৃত অশোকের শেষ চিৎকার? আমার গলা দিয়ে একটা আর্ত স্বর বেরিয়ে এল, "ছোটকা!"

ছোটকা চুল আঁচড়াচ্ছিল। চমকে উঠে আমার দিকে তাকাল, "কী রে, কী হয়েছে?"

আমার বুকের ভিতরটা তখনও ধক ধক করছিল। একটু ধাতস্থ হয়ে আমি সব কথা ছোটকাকে বললাম। ছোটকার কৌতূহলও অনন্ত। কৌতূহল, নাকি অনুসন্ধিৎসা? 'তারপর', 'তারপর' করে জিজ্ঞাসা করেই যায়। আমিও সব বলে দিলাম, মায় প্রমিতার পারফিউমের গল্পও। বলতে পারলাম না শুধু সেই রাতে প্রমিতার প্রতি আমার চোরা আকর্ষণটুকুর কথা।

শুনতে শুনতেই ছোটকার রিফ্রেশমেন্ট পর্ব শেষ হয়েছিল। ইতিমধ্যে

সকালের চা-টাও এসে গেল। চায়ের কাপে লম্বা একটা চুমুক দিয়ে ছোটকা বলল, “আচ্ছা দীপু, অশোকবাবুকে তুই শেষ কখন দেখেছিস?”

প্রশ্ন শুনেই হাঁ হয়ে গেলাম। শেষে কি ও আমাকে জেরা শুরু করল? বিস্ময় চেপে তবু ভাবতে শুরু করলাম। চায়ের কাপে শেষ চুমুকটা দেওয়ার পর মনেও এল। “তা প্রায় রাত একটা নাগাদ।”

“কোথায়?”

“আমি টয়লেটে যাচ্ছিলাম। দেখলাম কামরায় ওঠার দরজার পাশে একটি মেয়ের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গল্প করছে।”

“কার সঙ্গে, প্রমিতা?”

“মুখটা দেখতে পাইনি। তবে মনে হয় প্রমিতা নয়, অন্য কেউ। প্রমিতাকে তো চুড়িদার পরা দেখিনি। এই মেয়েটি চুড়িদার পরে ছিল।”

ছোটকারও চা শেষ হয়ে গিয়েছিল। “অ” বলে ও উঠে গিয়ে মোবাইল নিয়ে বসল। আমিও ঢুকে পড়লাম বাথরুমে। কোথাও বেড়াতে গেলে সকালে স্নান করে নেওয়া আমার অভ্যেস। সকাল থেকেই এতে বেশ ঝরঝরে লাগে নিজেকে, শুধু তাই নয় সারাটা দিন একেবারে নিশ্চিন্ত। যখন খুশি যেখানে খুশি ইচ্ছে যাও। স্নান করে বেরিয়ে দেখি ছোটকার ফোন-পর্ব তখনও চলছে।

“হ্যাঁ, ডেডবডি যেখানে পাওয়া গিয়েছিল সেখান থেকে ভুবনেশ্বর পর্যন্ত পুরো রাস্তাটাই একটু এক্সটেনসিভলি খুঁজো, স্পট থেকে অন্তত দশ-পনেরো কিলোমিটার রাস্তা। ঝুপড়ি বা বস্তিজাতীয় কোনও লোকালয় থাকলে লোকজনকেও একটু জিজ্ঞেস কোরো।... রিপোর্টটা কখন দিতে পারবে আমায়?... কখন চাই? শোনো, সেদিন ওই কামরায় যে ক’জন প্যাসেঞ্জার ছিলেন তাদের সবাইকে আপাতত ডিটেইন করে রাখা হয়েছে। আমার কথাতেই ও.সি. রেখেছেন। বুঝতেই পারছ এটা বেশিদিন করা যাবে না।... হ্যাঁ, সঞ্জয় আমার বন্ধু। এম.এস.সি.টা আমরা একসঙ্গেই করি।... অন্য কামরার লোকদের বাদ দিচ্ছি কেন? আমার কাছে খবর আছে ওই কামরা থেকে অন্য কামরায় যাওয়ার দুদিকের দু’টো ভেস্টিবিউলই সেদিন খারাপ ছিল। ইনফ্যাক্ট, সেদিন ট্রেন খুরদা স্টেশনে অতক্ষণ দাঁড়িয়ে একটা কারণ ওই ভেস্টিবিউল দুটো মেরামত করে নেওয়া। অবশ্য ট্রেন খুরদা স্টেশনে অতক্ষণ দাঁড়িয়ে না থাকলে খোঁজাখুঁজিটাও করা যেত না।... হ্যাঁ, হতে পারে। হতে পারে বালাসোরে আনঅথরাইজড কেউ উঠেছিল, কাজ সেরে সে কটকে নেমে যায়। তো সেক্ষেত্রে কিছু করার নেই আপাতত।... কাল